রবীন্দ্রসঙ্গীত ও তার প্রকাশে তাত্ত্বিক ও নান্দনিক বোধ*

- মো: আনিসুর রহমান

রবীন্দ্রসঙ্গীত বিশ্বকবির সব সৃষ্টির মধ্যে সবচাইতে প্রিয় সৃষ্টি, এবং তাঁর গর্ব ছিল যে বাঙ্গালি তাঁর আর সব অবদান ভুলে গেলেও তাঁর গান গাওয়া ছাড়তে পারবে না। এই দাবী যে কতখানি সত্যি ছিল আজকে তাঁর মৃত্যুর ছেষট্টি বছর পরেও তাঁর গানের প্রতি বাঙ্গালির অম্লাণ আকর্ষণে প্রমাণিত হয়ে আছে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর গান রচনায় কোন গতানুগতিক সঙ্গীততত্ত্ব অনুসরণ করেন নি। তাঁর গানের ভিত্তি ভারতীয় রাগ সঙ্গীত একথা নিংসন্দেহে, যার সঙ্গে তিনি উত্তরোত্তর বাউল-কীর্তনের সরু-বিন্যাস ও চাল মিশ্রিত করেছেন। কিন্তু রাগসঙ্গীতের হবহু নিয়ম মেনে তিনি গান রচনা করেননি। কোন বিষয়েই তিনি প্রথাগত নিয়ম মেনে চলেন নি, সব বিষযেই তাঁর হাতে নতুন কিছু সৃষ্টি হয়েছে। সঙ্গীতে তিনি কথা ও সুরকে মিলিয়ে একটা যৌগিক সৌন্দর্য সৃষ্টি করতে চেয়েছেন। শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে কথার স্থান একেবারেই গৌণ, কথা সুর-বিন্যাসের একটা অবলম্বন মাত্র, এবং তাকে অত্যন্ত অবহেলা-ভরে বিকৃত করে টেনে-হিঁচড়ে সুর তার নিজের সৌন্দর্য সৃষ্টি করে এক-একটা রাগের সুর-বিন্যাসের নিয়মের মধ্যে থেকে সেই রাগের সৌন্দর্য ও গভীরতা প্রকাশ করবার জন্য। কবি রবীন্দ্রনাথের সব গানে তাঁর অসামান্য কথার মর্যাদা পূরোভাগে, এই কথাগুলিকে সুন্দর করে প্রকাশের জন্যই তাতে সুর দেয়া হয়েছে, কখনোই একটা রাগের সৌন্দর্যকে দেখাবার জন্য কথাকে বাহন হিসাবে ব্যবহার করা হয় নি। এই প্রকাশের জন্য তাঁর বিভিন্ন গানে বিভিন্ন রাগ বা রাগ-সমষ্টির প্রভাব কম-বেশি দেখা যায়। তাঁর প্রথম দিকের রচনায় এই প্রভাব বেশি, এবং অনেক গানে বলা যায় যে সুরবিন্যাসটা মূলত: অমুক রাগের আশ্রয়ে রয়ে গেছে। কিন্তু ক্রমে এই প্রভাবকে অতিক্রম করে অত্যন্ত স্বাধীনভাবে তিনি সুর-বিন্যাস করেছেন, তাতে কোন কোন রাগের প্রভাব কম-বেশি দেখা যায়, কিন্তু সমস্ত গানটা কোন একটা রাগের বা রাগমালার সুরবিন্যাসের নিয়ম অনুসরণ করে না, অত্যন্ত স্বত:স্ফুর্তভাবে এক রাগের সুরবিন্যাসের মধ্যে ঢুকে স্বাচ্ছন্দ্যে অন্য রাগের আঙ্গিনায় ঢুকে যায়, অনেক গানে একই সঙ্গে বাউল-কীর্তনের ছাঁচও মিশে যায়। এই সম্পূর্ণ রাবীন্দ্রিক সৃষ্টির প্রেরণা কবির কথাটাকে সুরের সাহায্যে ভীষণ সুন্দর করে বলবার সহজাত আকুতি। এইভাবে তাঁর গানে কথা ও সুরের সৃষ্টিশীল মিলনে একটা নতুন সৌন্দর্য সৃষ্টি হয়েছে যাতে সুর রাগসঙ্গীতের নিয়ম-কানুন ছেড়ে দিয়ে কথার হাত ধরেছে তার সুন্দরতম প্রকশের জন্য, তাতে বিভিন্ন রাগের ছায়া আছে কিন্তু নিয়মবদ্ধ কায়া নেই।

একই প্রেরণা থেকে, অর্থৎ কথাকে সুরের সাহায্যে প্রকাশ করাটাকেই মূল প্রেরণা নিয়ে, কবি তাঁর গানে শাস্ত্রীয় তালকেও প্রাধান্য দেন নি। কিছু 'বৈতালিক' গান ছাড়া তালের ছন্দটাকে - যেটাকে উনি 'লয়' বলেছেন - প্রাধান্য দিয়েছেন কিন্তু তালের শাস্ত্রীয় নিয়মকে নয়। তালের শাস্ত্রীয় নিয়মে সোম-ফাঁক থাকে, চক্রাকারে নির্দিষ্ট মাত্রাসমষ্টির পরে সোমে ফিরে ফিরে আসা থাকে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে এরকম সোম-ফাঁকের বাঁধন পছন্দ করেননি, বলেছেন "এই কৃত্রিম তালের প্রথা ভাবের হস্তপদে একটা অনর্থক শৃঙ্খল বাঁধিয়া দেয়"। এরকম সোম-ফাঁকের নিয়মকে তিনি বলেছেন "মাথায় জলপূর্ণ কলস লইয়া নৃত্য করা"-র মতো "একপ্রকার কষ্টসাধ্য ব্যায়াম"("সংগীত ও ভাব")। তাঁর গানের স্বরলিপিতে-যে শাস্ত্রীয় তালের নির্দেশ রয়েছে সেগুলি তাঁর দেয়া নয়, স্বরলিপিকারদের ওস্তাদি। তিনি নিজে কখনো তবলার সঙ্গে গান করেন নি। তাঁর গানে তিনি যে নানারকম তাল ব্যবহার করেছেন এবং কয়েকটা নতুন তাল উদ্ভাবনও করেছেন সেগুলি নানানরকম ছন্দের এক্সপেরিমেন্ট হিসাবেই দেখা প্রয়োজন শাস্ত্রীয় তাল হিসেবে নয়। এদিক দিয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতে সঙ্গতের চেতনা ভারতীয় মার্গসঙ্গীতের চেতনার চাইতে অন্যান্য দেশের চেতনার সঙ্গে একাত্ম যেখানে গানের ছন্দের সঙ্গে সঙ্গ দেবার জন্য কোন বাদ্যযন্ত্র কখনো থাকে কিন্তু তা কখনো

গানের কথার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে নিজেকে আলাদা করে প্রকাশ করতে চায় না, এবং সোম-ফাঁকের বাঁধন, যাকে রবীন্দ্রনাথ "আরোও কড়াক্কড় করা" বলেছেন ("সংগীত ও ভাব"), তা থাকে না।

এর থেকে আমি একথা বলছি না যে রবীন্দ্রসঙ্গীতে তবলার সঙ্গত বর্জন করা উচিত, যদিও রবীন্দ্রসঙ্গীত-বিশেষজ্ঞ কেউ কেউ এরকম মত দিয়েছেন[ব]। তবে তবলার সঙ্গত গানের কাব্যকথা প্রকাশকে ছাড়িয়ে নিজেকে যেন কখনোই জাহির না করে এ-সম্বন্ধে গায়ক-শিল্পী ও তবলা-শিল্পী উভয়েরই সচেতন থাকা উচিত। এই দর্শন বুঝতে পেরে শ্রী শৈলজারঞ্জন মজুমদার তাঁর শেষের দিকের কিছু রবীন্দসঙ্গীতের স্বররিপিতে শাস্ত্রীয় তালে স্বরলিপি না করে শুধু মাত্রাবিভাগ ও মোটা ছন্দের হিসাব দেখিয়েছেন। তবে মনে হয় এটা তিনি বড়ো দেরি করে ফেলেছেন, যার ফলে রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশনে তবলার অত্যাচার এবং তবলার শাস্ত্রকে প্রাধান্য দিতে যেয়ে অনেক গায়কেরই গায়কির আড়ষ্টতা সৌন্দর্য-পিয়াসি শ্রোতাদের পীড়া দেয়।

নান্দনিক বোধ

রবীন্দ্রসঙ্গীতের নান্দনিক বোধের প্রশ্নটি অত্যন্ত গভীর একটি প্রশ্ন। কবি সঙ্গীতের সৌন্দর্যকে একটি অনির্বচনীয় উপলব্ধির ব্যাপার হিসেবে দেখেছেন যা সুর-তাল, যা গানের 'অবয়ব', তা দিয়ে ধরা যায় না যেমন - তিনি নিজেই এই উপমাটি দিয়েছেন - পদ্মফুলের সৌন্দর্য তার অবয়ব দিয়ে ধরা-ছোঁওয়া যায় না, অবয়বের অতীত একটা অনির্বচনীয় কিছু আছে যা তার সৌন্দর্যকে প্রকাশ করে। এই দুটির পার্থক্যকে কাগজের ফুল আর জীবন্ত ফুলের সৌন্দর্যের পার্থকের সঙ্গে, মোমের মানুষ আর জীবন্ত মানুষের সৌন্দর্যের পার্থক্যের সঙ্গে, তুলনা করা যেতে পারে। সঙ্গীতের আসল সৌন্দর্যটি প্রকাশ হয় তার মধ্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করলে, যে প্রাণের পরিচয় গানের ভাব-প্রকাশে। এই ভাব প্রকাশ অপরের গানের স্টাইল অনুকরণ করে হয় না। কবি নিজেই বলেছেন, "অবিকল নকল দেখিলেই বুঝা যায় যে, অনুকরনকারী অনুকৃত পদার্থের ভাব আয়ত্ত করিতে পারেন নাই"। ভাব-প্রকাশ শিল্পীর নিজস্ব, স্বকীয়, জীবন্ত সৃষ্টি, কবির নিজের কথায় "তাহা যে তখন-তখনি জীবন-উৎস হইতে তাজা উঠিতেছে"(সংগীতের মুক্তি)।

একথা অবশ্য যে কোন সঙ্গীতের সৌন্দর্য সম্বন্ধেই সত্যি, এবং বিশ্বে সঙ্গীতের সৌন্দর্য সম্বন্ধে পূরোভাগের এই চিন্তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নিজের চিন্তাও একই ছিল। বিশ্বে সুন্দর গানের প্রত্যয় ধ্রুপদী রূপ ধারণ করে ১৭-১৮ শতাব্দীতে রেনেসাঁ-উত্তরকালে ইতালীতে "বেল কান্তো" (অর্থ "সুন্দর গান") নামে একটি সঙ্গীতধারার প্রত্যয়গত ও অনুশীলনগত বিকাশে , যে ধারার সৌন্দর্যের প্রত্যয় আজো সমস্ত বিশ্বে সঙ্গীতের সৌন্দ্রর্যের শ্রেষ্ঠ প্রত্যয় বলে স্বীকৃত। গায়কীর দিক থেকে বেল কান্তো গানে বিরাট রেঞ্জে সুর অনায়াসে বয়ে চলে সমুদ্রের ঢেউএর মতো ওঠানামা ক'রে। আর রবীন্দ্রনাথও সঙ্গীতের সৌন্দর্যকে এইভাবেই দেখেছেন, এবং সঙ্গীতের সৌন্দর্যকে "সমুদ্রের জোয়ার ভাঁটার ...সৌন্দর্যনৃত্যের পাদবিক্ষেপ" বলে বর্ণনা করেছেন। সমুদ্রের ঢেউপ্রবাহের মতোই সুন্দর গানের বিশেষ কয়েকটি গুণ থাকতেই হবে, যথা:

১. সুরের চরিত্র তরল, অর্থাৎ তার প্রকাশে কোন চাপ নেই তা সে মৃদু স্বরে গাওয়া হোক বা প্রবল স্বরে গাওয়া হোক,
২. সুর (বিশেষ নাটকীয় ভাব প্রকাশের প্রয়োজন ছাড়া) কাটা কাটা করে চলে না, গড়িয়ে চলে বা বয়ে চলে, । রবীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে 'গড়ানে করে গাওয়া'-কে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন - ইংরাজীতে যে গায়কীকে "লিগাটিসিমো" স্টাইলে গাওয়া বলে - যে গায়কীতে আগের সুর থেকে পরের সুরে যাবার মুহুর্তটা স্পষ্ট নয়, যেন পরের সুর আগের সুরের ভিতর থেকেই বেরিয়ে আসে।(সংগীতের মুক্তি)

৩. ভাবের তারতম্য অনুযায়ী সুরের 'রং' বদলায়, সমুদ্রের ঢেউএর মতো বা আকাশের মেঘের মতো - একই শিল্পীর গানে কোন যায়গায় সুর মিষ্টি, কোন জায়গায় গম্ভীর, কোথাও মধুর-গম্ভীর, কোথাও গভীর, ইত্যাদি।

সব শেষ কথা, রবীন্দ্রসঙ্গীতের নান্দনিকবোধ কবির গানের অসাধারণ সুন্দর করে বলা গভীর বক্তব্যকে সঙ্গীতশিল্পী কবির দেয়া সুরে-ছন্দে কত সুন্দর করে বলতে পারেন এই চ্যালেঞ্জেরই বোধ। এই বোধ শুধু কর্মশালার আলোচনায় বোঝানো যায় না শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের গাওয়া গান শুনিয়ে তার সৌন্দর্য এবং কেন গানটি এত সুন্দর লাগছে তার বিশ্লেষণ না করে।

---

*রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৪৬ তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে ১৮-ই মে ২০০৭ তারিখে এশীয় শিল্প ও সংস্কৃতি সভা, ঢাকা আয়োজিত কর্মশালায় দেয়া বক্তৃতার সারাংশ।

[i] যেমন শ্রী ভি বালসারা বলেছেন, "রবীন্দ্রসঙ্গীত ভাষায় ও ছন্দে সম্পূর্ণ। গান আরম্ভ হলেই তার ছন্দের দোলা এবং বক্তব্যের পূর্ণ নিষ্পত্তির ইঙ্গিত স্থায়ী অংশেই বোঝা যায়। সুতরাং তবলা বাজিয়ে ছন্দের দোলাকে ব্যবচ্ছেদ করবার প্রয়োজন বোধ করি নিষ্প্রয়োজন।" (রবীন্দ্রসঙ্গীতে বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার, *রবীন্দ সংগীত: প্রয়োগ ও পরিবেশন আলোচনা চক্র,* রবীন্দ্রচর্চাভবন ২৪শে ও ২৫শে নভেম্বর, ১৯৯১. টাগোর রিসার্চ ইনষ্টিটিউট, করকাতা।)
সত্যজিত রায়ও রবীন্দ্রসঙ্গীতে তবলার ব্যবহারের বিরুদ্ধে মত দিয়েছেন ("রবীন্দ্রসংগীতে ভাববার কথা", রবীন্দ্রসংগীতচিন্তা, সুব্রত রায় সম্পদিত, প্রতিভাস, কলকাতা, ১৯৯৩)